আর-রাহীকুল মাখতূম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ আচার-আচরণ ও গুণাবলী (الصِّفَاتُ وَالْأَخْلَاقُ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

আত্মার পূর্ণত্ব ও আচার আচরণের আভিজাত্য (كَمَالُ النَّفْسِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ):

নাবী কারীম (ﷺ) বাকপটুতা ও বাগ্মীতার জন্য অত্যন্ত মশহুর ছিলেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ এক বাকপটু ব্যক্তিত্ব। প্রয়োজন মতো সঠিক শব্দ চয়ন ও সংযোজনের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন বাক্য বিন্যাসের ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। তৎকালীন আরবে প্রচলিত সর্বপ্রকার ভাষারীতি অনুধাবন এবং যে কোন প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে তার যথাযথ প্রয়োগের এক দুর্লভ ক্ষমতা তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল। কাজেই, আরবের যে কোন গোত্রের ভাষা অনুধাবন এবং অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে তা ব্যবহার করতে তিনি সক্ষম হতেন। একদিকে প্রত্যন্ত মরু অঞ্চলের বেয়াড়া বেদুঈনদের সঙ্গে যেমন তিনি অত্যন্ত সঙ্গত পন্থায় ভাব বিনিময় করতে এবং বক্তব্য পেশ করতে সক্ষম হতেন, অন্য দিকে তেমনি আবার নগরবাসী আরবগণের সঙ্গে অত্যন্ত উন্নত ও মার্জিত ভাষায় কথোপকথন ও বক্তব্য পেশ করতে সক্ষম হতেন। তাছাড়া তাঁর জন্য ছিল ওহীর মাধ্যমে আসমানী সমর্থন।

নাবী কারীম (ﷺ) ছিলেন সর্ব প্রকার মানবিক গুণে গুণান্বিত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। ধৈর্য্যশীলতা, সহনশীলতা, দয়ার্দ্রচিত্ততা, সংবেদনশীলতা, পরহিতব্রততা, ক্ষমাশীলতা ইত্যাদি যাবতীয় মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায়। মানব জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বহুবিধ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিগণের মধ্যেও কোন না কোন দোষত্রুটি পরিলক্ষিত হত। কিন্তু রাসূলে কারীম (ﷺ) ছিলেন সকল রকম মানবিক গুণে গুণান্বিত এমন ব্যক্তিত্ব যে ক্ষেত্রে কস্মিনকালেও কোন ব্যাপারে সামান্যতম ত্রুটিবিচ্যুতিও পরিলক্ষিত হয়নি। এক্ষেত্রে সব চাইতে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার ছিল এটা যে, শত্রুদের শত্রুতা এবং দুষ্ট লোকদের দুষ্টুমির মাত্রা যতই বৃদ্ধি পেত নাবী কারীম (ﷺ)-এর সহনশক্তি এবং ধৈর্যশীলতা ততোধিক মাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতো।

আয়িশা (রাঃ) বলেছেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে যখনই দুটি কাজের অধিকার দেয়া হতো কিংবা দুটি কাজের সুযোগ তাঁর সম্মুখে উপস্থাপিত তিনি সহজতর কাজটি গ্রহণ করতেন। কিন্তু কোন প্রকার অন্যায় কিংবা পাপের কাজ হলে কখনই তা গ্রহণ করতেন না। অন্যায় কিংবা পাপের কাজ হলে সর্বপ্রথম তিনিই তা থেকে বিরত হয়ে যেতেন। নাবী কারীম (ﷺ) ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি কৃত কোন অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার অবমাননাকর কোন কাজ কিংবা কথার তিনি তৎক্ষণাত প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ক্রোধ এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতার উর্ধ্বে অবস্থান করতেন।[1]

ন্যায়সঙ্গত কোন চুক্তি কিংবা বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে তিনিই সহজভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করতেন। সমগ্র মানবজাতির জন্য তাঁর দয়া ও দানশীলতার কোন তুলনা মেলেনা। নাবী কারীম (ﷺ) অভাব অনটন এবং দরিদ্রতা বিমুক্ত মন নিয়েই সব সময় দান খয়রাত করতেন। দান খয়রাতের ব্যাপারে অভাব অনটন দরিদ্রতা সম্পর্কে তাঁর মনে কখনই কোন আশঙ্কার উদয় হতো না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ‘নাবী কারীম (ﷺ) ছিলেন সর্বাধিক দান-দক্ষিণার মূর্ত প্রতীক। দান-দক্ষিণার ব্যাপারে তিনি ছিলেন দরিয়ার ন্যায় উদার, উন্মুক্ত। নাবী কারীম (ﷺ)-এর এ দানের হাত রমাযানুল মুবারকের সময় আরও অধিক প্রসারিত হতো যখন জিবরাঈল (আঃ) তাঁর

সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তশরীফ আনয়ন করতেন। এ প্রসঙ্গে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য যে, জিবরাঈল (আঃ) আগমন করতেন এবং কুরআন পুনরাবৃত্তি করতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সদকা খায়রাতে (রহমতের ভান্ডারে পরিপূর্ণ) প্রেরিত হাওয়া হতেও অধিক অগ্রসর থাকতেন।[2] জাবির (রাঃ) বলেছেন, ‘এমনটি কখনোও হয় নি যে, নাবী কারীম (ﷺ)–এর নিকট কিছু যাচঞ্চা করা হয়েছে, কিন্তু তিনি যাচঞ্চাকারীকে যাচঞ্চাকৃত বস্তু দান করেননি কিংবা ‘না’ কথাটি বলেছেন।[3]

বীরত্ব এবং সাহসিকতায় নাবী কারীম (ﷺ)–এর স্থান ছিল সর্বাগ্রে। তিনি ছিলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ। অত্যন্ত সংকটময় মুহূর্তে এবং সমস্যাসংকুল স্থানে যেক্ষেত্রে প্রখ্যাত বীর পুরুষদের স্থানচ্যুত হয়ে পশ্চাদপসরণ করতে দেখা গেছে, সেরূপ ক্ষেত্রেও নাবী কারীম (ﷺ) স্বস্থানে অটল থেকে সম্মুখ পানে অগ্রসর হয়েছেন। সম্মুখ সমরে কোন না কোন ক্ষেত্রে মশহুর বীর পুরুষদেরও পলায়নরত পরিলক্ষিত হয়েছে, কিন্তু নাবী কারীম (ﷺ)–এর ক্ষেত্রে কখনই এমনটি পরিলক্ষিত হয় নি। আলী (রাঃ) বলেছেন, ‘সম্মুখ সমরে যখন বিভীষিকাময় অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যেত তখন আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর আড়ালে অবস্থান করতাম। কোন শত্রু নাবী কারীম (ﷺ)–এর নিকটবর্তী হওয়ার সাহস পেত না।[4]

আনাস (রাঃ) বলেছেন, ‘মদীনাবাসীগণ বিকট এক শব্দ শ্রবণে এক রাত্রে কিছুটা ভীত সন্ত্রস্ত্র হয়ে পড়লেন। শব্দ শ্রবণের পর শব্দের উৎপত্তিস্থলের দিকে দৌঁড় দিয়ে যেতে থাকলেন। পথে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাত হল। শব্দ শ্রবণ করে পূর্বাহ্নে তিনি লক্ষ্যস্থলে গমন করেছিলেন ‘খোঁজ খবর নেয়ার উদ্দেশ্যে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঐ সময় আবূ ত্বালহাহ (রাঃ)’র একটি পালানবিহীন ঘোড়ার উপর আরোহিত ছিলেন। তাঁর কাঁধে তরবারী কোষবদ্ধ অবস্থায় ছিল। তিনি লোকজনদের বললেন, ‘ভয়ের কিছুই নেই, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক।’ এটি হচ্ছে তাঁর নির্ভিকচিত্ততার এক জ্বলন্ত প্রমাণ।[5]

নাবী কারীম (ﷺ) ছিলেন সব চাইতে লজ্জাশীল এবং অবনত দৃষ্টিসম্পন্ন। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন যে, ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পর্দানশীনা কুমারীর চাইতেও অধিক মাত্রায় লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি যখন কোন কিছু অপছন্দ করতেন কিংবা কোন কিছু তাঁর অসহনীয় মনে হতো তাঁর মুখমণ্ডলেই তা প্রকাশ পেয়ে যেত।[6]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনই নিজ দৃষ্টি অন্যের উপর নিক্ষেপ করে অধিকক্ষণ ধরে রাখতেন না। তিনি সব সময় দৃষ্টি নীচের দিকে রাখতেন এবং আকাশের দিকে রাখার চাইতে মাটির দিকে দৃষ্টি রাখাটাই অধিক পছন্দ করতেন। সাধারণতঃ দৃষ্টি নিম্নমুখী রেখেই তিনি কোন কিছু দেখতেন। লজ্জা প্রবণতা তাঁর মধ্যে এত অধিক ছিল যে, কোন অপছন্দনীয় কথা কাউকেও তিনি মুখোমুখী বলতেন না। তাছাড়া কারো কোন অসহনীয় কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর কান পর্যন্ত পৌঁছতই না। তবে নাম ধাম নিয়ে এ ব্যাপারে আলাপ আলোচন করা হত। বরং বলা হত, ‘এ কেমন কথা যে কিছু লোক এরূপ বলাবলি করছে। ফারাযদাকের নিম্নোক্ত কবিতার তুলনা বিশুদ্ধভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজেই ছিলেন,

يغضي حياء ويغضي من مهابته ** فلا يكلم إلا حين يبتسم

অর্থ : লজ্জাশীলতার কারণে নাবী কারীম (ﷺ) দৃষ্টি নীচু রাখতেন এবং তাঁর ভয়ে অন্যান্যরা দৃষ্টি নীচু রাখতেন। তিনি যখন মৃদু হাসতেন তখন তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করা হত।

নাবী কারীম (ﷺ) ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক, সর্বাধিক পবিত্র, সর্বাধিক সত্যবাদী এবং সব চাইতে

নির্ভরযোগ্য আমানতদার। তাঁর এ সকল গুণাবলীর কথা বন্ধুগণ তো বটেই, শত্রুগণও এক বাক্যে স্বীকার করে থাকেন। নবুওয়াতের পূর্বে জাহেলিয়াত যুগে তাঁকে আমীন (বিশ্বাসী) উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। সে যুগেও বিরোধের ন্যায়সঙ্গত মীমাংসার উদ্দেশ্যে লোকেরা তাঁর নিকট আগমন করত। জামে তিরমিযীতে আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, ‘একবার নাবী (ﷺ)-এর নিকট আবূ জাহল এসে বলল, ‘আমরা আপনাকে মিথ্যুক বলছি না, তবে আপনি যা এনেছেন তাকে মিথ্যা বলছি’। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন,

(فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْنَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُوْنَ) [الأنعام:33]

‘এ লোকজনেরা আপনাকে মিথ্যা বলে না বরং এ জালেমেরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করছে।’ [আল-আন‘আম (৬) : ৩৩)।[7]

রোমক সম্রাট হিরাক্বল আবূ সুফইয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, ‘ওই নাবী সম্পর্কে তোমরা যে সব কথা বলছ তার পূর্বে কি তোমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী হিসেবে পেয়েছে?’ তখন আবূ সুফইয়ান উত্তরে বললেন, ‘না’।

নাবী কারীম (ﷺ) ছিলেন সব চাইতে বিনয়ী। তাঁর আচার আচরণে অহংকার কিংবা আত্মম্ভরিতার কোন ঠাঁই ছিল না। শাসক বা সম্রাটগণ যেভাবে খাদেম বা সেবকদের সঙ্গে আচরণ করে থাকেন তিনি তাঁর সাহাবা কিংবা সেবকগণের সঙ্গে কখনো সেরূপ আচরণ করতেন না। তিনি তাঁর সম্মানার্থে সাহাবীগণকে দন্ডায়মান থাকতে নিষেধ করতেন। তিনি অসহায়দের দেখাশোনা করতেন, পরমুখাপেক্ষীদের সঙ্গে উঠাবসা করতেন এবং দাসদের দাওয়াত কবুল করতেন। তাঁর এবং সাহাবাগণের মধ্যে কোন প্রকার ব্যবধান থাকত না। তিনি অত্যন্ত সাদাসিদে এবং সাধারণ ভাবেই তাঁদের সঙ্গে উঠাবসা করতেন। আয়িশা (রাঃ) বলেছেন যে, তিনি নিজেই জুতা সেলাই করতেন বা জুতার পট্টি লাগাতেন এবং নিজের কাপড় চোপড় নিজেই সেলাই করতেন। একজন সাধারণ মানুষের ন্যায় সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম তিনি নিজেই সম্পন্ন করতেন। নিজ হাতে ছাগী দোহন করতেন, কাপড় থেকে উকুন বেছে নিতেন এবং কাপড় চোপড় পরিস্কার করতেন।[৪]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছিলেন সর্বাধিক প্রতিজ্ঞাপরায়ণ এবং সকলের সঙ্গেই অত্যন্ত উঁচু মানের সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। দয়ার্দ্রতা, স্নেহশীলতা এবং দানশীলতায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম শিষ্টাচারী এবং তাঁর আচার আচরণ ছিল সব চাইতে উদার ও সর্বাধিক প্রশস্ত। কোন প্রকার সংকীর্ণতা কিংবা অশালীনতা থেকে তাঁর স্থান ছিল পূর্ব থেকে পশ্চিমের ন্যায় দূরত্বে। মুশরিককর্তৃক অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণা সত্ত্বেও কাউকেও তিনি কোন অভিশাপ দেননি কিংবা অন্যায়াচরণের পরিবর্তে অন্যায়াচরণ করেননি বরং প্রতিদানে তিনি দিয়েছেন ক্ষমা ও মার্জনা।

পথে চলতে গিয়ে কাউকেও তিনি পিছনে ফেলে যেতেন না। তাছাড়া, পানাহারের ব্যাপারে আপন দাসদাসীদের নিকট তিনি কখনই অহংকার করতেন না। স্বীয় সেবকদের প্রতি ইহসানির উদ্দেশ্যে তিনি তাদের কাজ কর্মে সাহায্য করতেন। স্বীয় সেবকদের কাজকর্মের কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি কখনই ‘উহ’ শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি কিংবা নিন্দা করেননি। তিনি অনাথ ও অসহায়দের ভাল বাসতেন, তাদের সঙ্গে চলাফেরা করতেন এবং তাদের জানাজায় উপস্থিত থাকতেন। দারিদ্রতার কারণে কোন দরিদ্রকে তিনি দীন-হীন মনে করতেন না।

একদা নাবী কারীম (ﷺ)-এর প্রবাসে থাকা অবস্থায় একটি ছাগল যবেহ করে তা রান্নাবান্নার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। একজন সাহাবী বললেন, ‘যবেহ করার দায়িত্ব আমার উপর বর্তিবে।’ দ্বিতীয় জন বললেন,‘ওর চামড়া ছাড়ানো আমার উপর বর্তিবে।’ নাবী কারীম (ﷺ) বললেন,(وَعَلَيَّ جَمْعُ الْحَطَبِ) ‘জ্বালানী সংগ্রহ আমার দায়িত্বে

থাকবে।’ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আরয করলেন, ‘আপনার কাজটা আমরাই করে নিব।’ তিনি বললেন,

(قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ تُكْفُوْنِيْ وَلٰكِنِّيْ أَكْرَهُ أَنْ أَتَمَيَّزَ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ اللهَ يَكْرَهُ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرَاهُ مُتَمَيِّزاً بَيْنَ أَصْحَابِهِ)

‘আমি জানি যে, তোমরা আমার কাজটা করে দেবে, কিন্তু আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমার ও তোমাদের মাঝে কোন পার্থক্য বা দূরত্ব থাকুক। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা এটা পছন্দ করেন না যে, তাঁর বান্দা নিজ বন্ধুদের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করেন।’

অতঃপর তিনি জ্বালানী একত্রীকরণের কাজে রত হয়ে গেলেন।[৭]

হিন্দ বিন আবী হালাহর বাচনিক বর্ণনা : হিন্দ বিন আবী হালাহর বাচনিক তথ্য সূত্রে রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর গুণাবলী সম্পর্কে আমরা কিছুটা অবগত হই। হিন্দ এক দীর্ঘ বর্ণনায় বলেছেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একের পর এক কতগুলো দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন। সর্বক্ষণ চিন্তাগ্রস্ত থাকার কারণে তাঁর মানসিক শান্তি স্বস্তির যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। বিশেষ প্রয়োজনে ছাড়া তিনি কথাবার্তা তেমন বলতেন না। দীর্ঘক্ষণ যাবত নীরব থাকতেন। তবে কথাবার্তা যা বলতেন তা সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্টভাবেই বলতেন। তাঁর কথাবার্তার মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিংবা অসম্পূর্ণ কোন কথাবার্তা থাকত না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল স্বভাবের, মিষ্টভাষী এবং কৃতজ্ঞাতাপরায়ণ। সামান্য অনুগ্রহেরও তিনি বড়ই কদর করতেন। কোন ব্যাপারে তিনি কারো নিন্দা করতেন না কিংবা অসাক্ষাতে কিছু বলতেন না।

কোন খাদ্যদ্রব্যকে তিনি কখনো খারাপ বলতেন না। সত্য সম্পর্কিত প্রশংসায় কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে যতক্ষণ তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ না করতেন ততক্ষণ তাঁর ক্রোধ স্তিমিত হতো না। তবে, নিশ্চিতরূপে তিনি প্রশস্ত অন্তরের অধিকারী ছিলেন। ব্যক্তিগত কোন ব্যাপারে তিনি ক্রোধান্বিত হতেন না, প্রতিশোধও গ্রহণ করতেন না। কোন কিছুর জন্য যখন হাত দিয়ে ইশরা করতেন তখন পুরো হাত ব্যবহার করতেন। কোন ব্যাপারে অবাক হওয়ার সময় হাত ফিরাতেন। যখন রাগান্বিত হতেন তখন চেহারা মুবারক পরিবর্তিত হয়ে যেত, যখন সন্তুষ্ট হতেন তখন দৃষ্টি নিম্নমুখী হয়ে যেত। হাসির প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুচকি হাসি হাসতেন। হাসির সময় দাঁতগুলো বরফের ন্যায় চমকাতে থাকত।

অনর্থক কথাবার্তার ক্ষেত্রে তিনি মুখ বন্ধ রাখতেন। বন্ধু বান্ধবগণের সঙ্গে তিনি সব সময় সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিদের তিনি সম্মান করতেন এবং সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের অভিভাবক হিসেবে গণ্য করতেন। মানুষের ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন সব কার্যকলাপ থেকে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করতেন কিন্তু এ জন্য কারো নিকট তিনি নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করতেন না।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) নিজ সঙ্গীসাথীগণের খবরাখবর রাখতেন এবং মানুষের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। ভাল জিনিসের প্রশংসা ভাল কাজের সুফল এবং খারাপ জিনিসের মন্দ প্রভাব ও খারাপ কাজের কুফল সম্পর্কে বলতেন এবং সর্বক্ষেত্রেই সততা ও সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করতেন। কোন ব্যাপারেই তিনি বাড়াবাড়ি করতেন না কিংবা চূড়ান্ত পন্থাও অবলম্বন করতেন না। সর্ব ব্যাপারেই তিনি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতেন এবং অনুরূপ পন্থাবলম্বনের জন্য অন্যদেরও উৎসাহিত করতেন। কোন ব্যাপারেই তিনি অমনোযোগী থাকতেন না যেন আল্লাহ না করুন লোকেরাও অমনোযোগী এবং আত্মসমাহিত হয়ে না পড়ে। যে কোন প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে তৎপরতা অবলম্বনের জন্য তিনি সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতেন। কোন সত্যকেই তিনি ক্ষুদ্র ভাবতেন না। কোন অসত্য, অন্যায় কিংবা অসুন্দরকে তিনি কখনই সমর্থন করতেন না। যাঁরা নাবী কারীম (ﷺ)-এর সংস্পর্শে থাকতেন তাঁরা

ছিলেন সর্বোত্তম শ্রেণীভুক্ত। এদের মধ্যে আবার তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি ছিলেন সকলের চাইতে মঙ্গলকারী। রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর নিকট তিনিই ছিলেন সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী যিনি সাহায্য ও সহানুভূতিতে ছিলেন সবার চাইতে অগ্রগামী।

নাবী কারীম (ﷺ) উঠতে বসতে সর্বক্ষণ আল্লাহর নাম স্মরণ করতেন। নিজের জন্য কখনো তিনি স্থান নির্দিষ্ট করে রাখতেন না। কোন সভা সমাবেশে গিয়ে তিনি যেখানে স্থান পেতেন সেখানেই বসে পড়তেন। সঙ্গী সাথীদের প্রত্যেককেই ন্যায্য অংশ প্রদান করতেন। তিনি কখনো কাউকেও এমন ধারণা করার সুযোগ দেন নি যে, নাবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট অমুকের তুলনায় অমুক অধিক সম্মানিত। কেউ কোন প্রয়োজনে নাবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট বসলে কিংবা দাঁড়ালে নাবী (ﷺ) এত ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে থাকতেন যে, সে নিজেই প্রত্যাবর্তন না করে পারত না। কোন প্রয়োজনে তাঁর নিকট কেউ কিছু চাইলে তৎক্ষণাৎ তিনি তাকে তা দিতেন, কিংবা ভাল কথা বলে বিদায় করতেন।

নাবী কারীম (ﷺ) ছিলেন সকলের জন্য পিতৃসমতুল্য এবং সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন। তাঁর নিকট অন্যদের মর্যাদার ভিত্তি ছিল তাক্বওয়া বা পরহেযগারী। তাঁর বৈঠক ছিল ধৈর্য, লজ্জা, শিক্ষা এবং বিশ্বাসের বৈঠক। স্বাভাবিক কথোপকথনে কিংবা আলাপ আলোচনার ক্ষেত্রে কখনই তিনি উচ্চ কণ্ঠ ব্যবহার করতেন না। কারো মান মর্যাদার হানিকর কোন কথাবার্তা তিনি কখনই বলতেন না। তাক্বওয়ার ভিত্তিতে অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি পারস্পরিক সম্পর্ক, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বজায় রাখতেন। তিনি বয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গত মর্যাদা দান করতেন। ছোটদের প্রতি স্নেহশীল এবং দয়ার্দ্র থাকতেন। গরীব দুঃখীদের সাহায্য করতেন এবং পরিচিত অপরিচিত সকলেরই সমাদর করতেন।

নাবী কারীম (ﷺ)-এর সব সময়ই প্রফুল্লতা বিরাজমান থাকত। অপ্রয়োজনীয় কাজ, কথা কিংবা বিষয় বস্তুর প্রতি তিনি মনোযোগ দান করতেন না। স্বীয় আত্মার পবিত্রতা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি তিনটি পন্থা অবলম্বন করতেন, যথা : (১) বাহ্যিড়ম্বরের বাড়াবাড়ি বর্জন, (২) কোন কিছুর আধিক্য পরিহার করে চলা, (৩) অনর্থক কথাবার্তা এড়িয়ে চলা। তাছাড়া তিনটি অপ্রীতিকর বিষয় থেকে তিনি মনকে মুক্ত রেখেছিলেন, যথা : (১) গীবত বা পরনিন্দা, (২) অন্যকে লজ্জা দেয়া, (৩) অন্যের দোষক্রটি অনুসন্ধান করা।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সে সকল কথাই বেশী বলতেন যে সকল কথায় পুণ্যের আশা থাকত। তিনি যখন কথাবার্তা বলতেন তখন তাঁর সাহাবাগণ এমনভাবে মস্তক অবনত করে নিতেন যে, মনে হতো যেন তাঁদের মাথার উপর পাখি বসে রয়েছে। নাবী কারীম (ﷺ) যখন কথা বন্ধ করে দিতেন তখন সাহাবীগণ কথাবার্তা আরম্ভ করতেন। নাবী কারীম (ﷺ)-এর উপস্থিতিতে লোকজনেরা কখনই কোন অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেন না। তাঁর উদ্দেশ্যে এক জন কথা বললে অন্যেরা নীরবতা অবলম্বন করতেন এবং তাঁর কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউই কথাবার্তা বলতেন না। কোন প্রসঙ্গ নিয়ে সকলের মুখে হাসি দেখা দিলে তিনিও সে হাসিতে অংশ গ্রহণ করতেন। কোন ব্যাপারে লোকজনেরা আশ্চর্য বোধ করলে তিনি তা প্রকাশ করতেন।

অপরিচিত ব্যক্তি বাচালতাজনিত অত্যাচারের মাধ্যমে কাজ হাসিল করতে চাইলে তিনি ধৈর্যাবলম্বন করতেন এবং বলতেন, 'যখন তোমরা অভাবগ্রস্তদের দেখবে যে তারা আপন আপন প্রয়োজন পরিপূরণের অন্বেষায় রয়েছে তখন তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য দান কর'। নাবী কারীম (ﷺ) ইহসানের পারিশ্রমিক দাতা ছাড়া অন্য কারো প্রশংসা করতেন না।[10]

খারিজাহ বিন যায়দ (রাঃ) বলেছেন, ‘নাবী কারীম (ﷺ) আপন আলোচনা বৈঠকে প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদা সহকারে কথাবার্তা বলতেন। স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আবরণের বাইরে প্রকাশ করতেন না। অযৌক্তিক কিংবা অপ্রয়োজনে কোন কথাবার্তা বলতেন না, নীরবতা অবলম্বন করতেন, কেউ কোন অযৌক্তিক কথা বললে তিনি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতেন। হাসির প্রয়োজনে তিনি মৃদু মৃদু হাসতেন। অতিরঞ্জিত কথাবার্তা বলতেন না এবং বেশী কথা না বলে অল্প কথাতেই বক্তব্য পরিস্কারভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতেন। হাসির প্রয়োজনে সাহাবীগণও নাবী কারীম (ﷺ)-এর অনুসরণে মৃদু হাসতেন।[11]

সার কথা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছিলেন অতুলনীয় ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত ও সুশোভিত সর্ব কালোপযোগী এক পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নাবী কারীম (ﷺ)-কে এক অতুলনীয় আদর্শবোধ, একাগ্রচিত্ততা এবং চরিত্র সম্পদে ভূষিত করেছিলেন। তাঁর সুমহান চরিত্র সম্পদ সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

(وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ) [القلم: 4]

‘নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের উচ্চমার্গে উন্নীত।’ [আল-ক্বলাম (৬৮) : ৪]

নাবী কারীম (ﷺ)-এর প্রতি ভালবাসায় জনগণের অন্তর পরিপূর্ণ হয়েছিল। অধিকন্তু, তাঁর অতুলনীয় নেতৃত্ব ও প্রাজ্ঞ পরিচালনাধীন আত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধনের ফলে নাবী কারীম (ﷺ)-এর ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য, তাঁদের সমগ্র চেতনাকে আচ্ছন্ন রাখত। তাঁর এ ব্যক্তিমাধূর্যের প্রভাবেই রুক্ষ প্রকৃতির মরুচারী আরবগণ নম্রতাভূষণে ভূষিত হয়ে দ্বীনে ইলাহীতে দলে দলে প্রবিষ্ট হতে থাকেন।

উপর্যুক্ত যে আলোচনা করা হলো তা তাঁর পূর্ণাঙ্গ ও মহাগুণে গুণান্বিত চরিত্রের সামান্য চিত্র মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এ মহামানবের (ﷺ) চরিত্রের রূপরেখা চিত্রায়ণ কোন সাধারণ মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়- তা তিনি এ বিষয়ে যতই বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ হোন না কেন, যেমনটা অসম্ভব এর তলদেশ পরিমাপ করা।

এ পৃথিবীর কোন মানুষের পক্ষে অসম্ভব ঐ মহা মহিম ব্যক্তিটির পূর্ণত্বের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে তা সঠিক পরিমাপ করা যার আবাসিক ঠিকানা মানবত্বের সর্বোচ্চ শিখরে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং আপন প্রভু পরোয়ারদেগারের নূরে নূরান্বিত হয়ে অসামান্য কিতাব আলকুরআনের অবিকল ছাঁচে নিজ চরিত্রকে তৈরি করে নিয়েছেন।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

‘হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেমন রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানী। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তাঁর বংশধরের ওপর বরকত নাযিল কর যেমন বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানী।’

ফুটনোট

[1] সহীহুল বুখারী ১ম খন্ড ৫০৩ পৃ।

[2] সহীহুল বুখারী ১ম খন্ড ৫০২ পৃঃ।

[3] সহীহুল বুখারী ১ম খন্ড ৫০২ পৃঃ।

[4] কাজী আয়াত রচিত শেফা ১ম খন্ড ৮৯ পৃঃ। সেহাত্ এবং সুনানে মধ্যেও উত্তর অর্থবহ হাদীষ বিদ্যমান আছে।

[5] সহীহুল মুসলিম ২য় খন্ড ২৫২ পৃঃ, সহীহুল বুখারী ১ম খন্ড ৪০৭ পৃঃ।

[6] সহীহুল বুখারী ১ম খন্ড ৫০৪ পৃঃ।

[7] মিশকাত ২য় খন্ড ৫২১ পৃঃ।

[8] মিশকাত ২য় খন্ড ৫২০ পৃঃ।

[9] খোলাসাতুল সিয়ার।

[10] কাজী আয়াজ রচিত শেফাগ্রন্থের ১ম খন্ড ১২১-১২৬ পৃঃ। শামায়েল তিরমিযী দ্রষ্টব্য।

[11] প্রাগুক্ত

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6479

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন